আমাদের জানা মহাবিশ্ব

আনোয়ার হোসেন

তাম্রলিপি

উৎসর্গ

বাংলাদেশের সকল বিজ্ঞান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে জ্ঞান। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অর্জিত হয়েছে ঠিক একই প্রক্রিয়ায়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে আজ মহাবিশ্বকে আমরা অনেকখানি চিনেছি। তবে এখনো বেশ কিছু রয়ে গেছে অজানা, অনেক রহস্য আছে উন্মোচনের অপেক্ষায়। এটাই হয়তো জ্ঞানপিপাসার সৌন্দর্য।

'আমাদের জানা মহাবিশ্ব' বইটি মহাবিশ্ব নিয়ে আমাদের জ্ঞানের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। আমাদের জ্ঞানের শুরু সৌরজগৎ নিয়ে, এখানেই আমাদের আবাস। এরপরে আসে নক্ষত্র। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে কীভাবে আলো ও তাপশক্তি উৎপন্ন হয় অনেকটা নিশ্চিতভাবে আজ বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। নক্ষত্রের জন্ম রহস্যও হয়েছে উন্মোচিত। আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারিত হয়েছে গ্যালাক্সিতে। পৃথিবী কেন্দ্রিক ছোটো মহাবিশ্বের জায়গায় এসেছে গ্যালাক্সিময় বিশাল মহাবিশ্ব। গ্যালাক্সির কেন্দ্রে সুপারমেসিভ ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব নিয়ে আজ কোনো সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে অজানার পরিধিও বেড়ে যায়। দুটি অজানা বিষয় বর্তমানে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলছে—ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি। এদের রহস্য এখনো উন্মোচিত করা সম্ভব হয়নি। বইটিতে এই দুটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে পাঠকদের ধারণা দিতে।

মানুষের কল্পনাশক্তি সবসময় তার জ্ঞানকে অতিক্রম করে যায়। আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে ভিন্ন মহাবিশ্ব থাকার সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে আলোচনা চলছে। মাল্টিভার্স আজ একটি জনপ্রিয় টপিক যদিও সম্পূর্ণ বিষয়টি এখনো তাত্ত্বিক পর্যায়ে রয়েছে। শেষ অধ্যায়টি তাই পাঠকদের কিছুটা কৌতূহল মেটাতে পারবে বলে আশা করছি।

মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান জ্ঞান সহস্র মহাকাশবিদ ও বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফসল। তাদের মাঝে পেশাদার ও শৌখিন দুই ধরনেরই আছে।

বেশিরভাগই নিভৃতে কাজ করে থাকেন, কেউ টেলিস্কোপ ও ক্যামেরায় চোখ রাখছেন, অন্যরা গ্রাউন্ড বা স্যাটেলাইট ভিত্তিক টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে ব্যস্ত। অনেকেই দুর্গম এলাকা যেমন মরুভূমি, এমনকি অ্যান্টার্টিকার দুঃসহ পরিবেশে কাজ করেন। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের কোনো পরিচিতি বা জনপ্রিয়তা নেই। আমি এইসব নিভৃতচারীদের অভিবাদন জানাই।

অ্যাস্ট্রোনমি আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তরুণদের কাছে অ্যাস্ট্রোনমি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। 'আমাদের জানা মহাবিশ্ব' বইটি তাদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করছি এবং তাহলেই লেখক হিসেবে সার্থক বলে ধরে নেব।

সূচিপত্র

মহাবিশ্বকে নিয়ে কৌতুহলী মন ১৩

অ্যাস্ট্রোলজি আর অ্যাস্ট্রোনমি ১৩

গ্রিক কসমোলজি ১৫

কোপার্নিকাস ও অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রেভ্যুলেশন ১৭

আধুনিক বিজ্ঞান—জ্ঞানের উৎকর্ষ ১৮

সৌরজগৎ ২১

সৌরজগতের কাঠামো ২১

সৌরজগতের সৃষ্টি ২৩

গ্রহদের প্রদক্ষিণ পথ ২৩

সূর্য—পরিবারের প্রধান ২৫

সূর্যের গঠন ২৫

বুধ—কাছের গ্রহ ২৯

শুক্র—পৃথিবীর যমজ ৩০

পৃথিবী—জীবনের স্পন্দন যেখানে ৩২

চাঁদ—পৃথিবীর উপগ্রহ ৩৫

চাঁদের সৃষ্টি ৩৬

মঙ্গল—লাল গ্রহ ৩৮

মঙ্গলের গঠন ৩৮

বৃহস্পতি—বৃহত্তম ৪০

শনি—বলয় শোভিত ৪২

ইউরেনাস—বরফ দানব ৪৪

নেপচুন—অঙ্ক কষে পাওয়া ৪৫

প্লুটো—দল থেকে বাদ পড়া ৪৭

সৌর জগতের প্রান্তে ৪৮

নক্ষত্র জগৎ ৪৯

নক্ষত্রের নামকরণ ৪৯

নক্ষত্র—বিশাল পারমাণবিক চুল্লি ৫০

নক্ষত্রের প্রকারভেদ ৫১

নক্ষত্রের বিবর্তন ৫৩

নীহারিকা—নক্ষত্রের জন্ম সূতিকাগার ৫৫

নক্ষত্রের জুটি ৫৭

বিশেষ নক্ষত্র ৫৭

নক্ষত্রপুঞ্জ ৫৮

রাশিচক্র ৬০

এক্সোপ্লানেট ৬১

গ্যালাক্সি ৬২

ছায়াপথ গ্যালাক্সি ৬৪

লোকাল গ্রুপ ৬৭

ছায়াপথ পেরিয়ে মহাবিশ্ব ৬৮

বিগব্যাং—মহাবিশ্বের সূচনা ৭০

বিগব্যাং সময়পঞ্জি ও ঘটনাপ্রবাহ ৭২

ব্ল্যাকহোল ৭৬

ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি ৭৯

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ৮১

মহাবিশ্বের বিশালত্ব ৮৪

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ ৮৬

মাল্টিভার্স নিয়ে যত কথা ৮৮
- কসমোলজিক্যাল মাল্টিভার্স ৮৯
- এন্টিম্যাটার মাল্টিভার্স ৯০
- সাইক্লিক মাল্টিভার্স ৯০
- কোয়ান্টাম মাল্টিভার্স ৯১
- স্ট্রিং থিওরি ভিত্তিক মাল্টিভার্স ৯২

তথ্যসূত্র ৯৫

মহাবিশ্বকে নিয়ে কৌতুহলী মন

মহাবিশ্বকে জানার আগ্রহ চিরন্তন। আদিকাল থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে এর বিশালত্ব দেখে মানুষ অভিভূত হয়েছে। মহাকাশ মানুষের কল্পনাকে ডানা মেলতে প্ররোচিত করেছে। সেই সাথে মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণার বিবর্তন ঘটেছে। একটি সীমাবদ্ধ এলাকার মানুষের কাছে আমাদের পৃথিবী ছিল একটি খোলা মাঠের মতো সমতল। তার চারদিকে মহাসাগর যা দিগন্ত রেখায় আকাশের সাথে মিলে গেছে। পৃথিবীর ওপরে অর্ধগোলাকার আকাশ ছাদের মতো দাঁড়িয়ে। আকাশ, মর্ত্য ও পাতাল- মহাবিশ্বের তিনটি স্তর। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ আকাশের নিচে আর নক্ষত্রগুলো আকাশের সাথে লেগে আছে। সাগর ও মাটির নিচে আরেকটি বিশাল ভিন্ন জগৎ হলো পাতাল, ইংরেজিতে আন্ডারওয়ার্ল্ড।

সভ্যতা বিকাশের ধারায় মানুষের কাছে পৃথিবী আরও পরিচিত হয়েছে। কিন্তু আকাশ ও পাতাল থেকেছে তার জ্ঞানের বাইরে। এই অজ্ঞানতা পূরণে ভূমিকা রেখেছে ধর্ম। ধর্মের সাথে এসেছে স্বর্গ ও নরকের ধারণা। আকাশের উপরে স্বর্গ অদৃশ্যমান, সেখানে অমর দেবতাদেরও আবাস। নরক পাপীদের জন্য নির্ধারিত, দেবতাদের আবাসের সন্নিকটে সেটা বেমানান। তাই নরকের অবস্থান হলো পাতালে। পাপীরা ছাড়াও সেখানে রাজত্ব করে অপদেবতারা।

অ্যাস্ট্রোলজি আর অ্যাস্ট্রোনমি

মহাজাগতিক বস্তুগুলো মানুষের ভাবনায় বিচিত্র রূপ নিয়েছে। আকাশের গ্রহ ও নক্ষত্রদের ভেবেছে দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে। নক্ষত্রপুঞ্জকে কল্পনা করেছে দেবতার প্রাণীরূপের বহিঃপ্রকাশ। ক্রমান্বয়ে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে এদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে। কিছু বুদ্ধিমান মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ধারণ করে রাজ অভিষেক বা যুদ্ধবিগ্রহ শুরু করার

মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির সঠিক সময় সম্পর্কে রাজন্যদের পরামর্শ দিতে থাকে। পূজা পার্বন, বিবাহ অনুষ্ঠানের শুভলগ্ন জানার জন্য পুরোহিত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তাদের দ্বারস্থ হয়। এই কাজে প্রয়োজন হয় দীর্ঘকালব্যাপী মহাকাশের বস্তুগুলো পর্যবেক্ষণ ও তাদের অবস্থান লিপিবদ্ধ করা। এখান থেকেই জ্যোতিষশাস্ত্র (অ্যাস্ট্রোলজি) আর জ্যোতির্বিদ্যার (অ্যাস্ট্রোনমি) পথচলা শুরু হয় হাতে হাত ধরে।

শুধু ভাগ্য গণনাতেই মহাকাশ পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেসময়ের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল কৃষি। ফসল রোপণ ও কাটার জন্য উপযোগী সময় নির্ধারণ ছিল জরুরি। এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে অ্যাস্ট্রোনমি। ঋতু সংশ্লিষ্ট বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নে অ্যাস্ট্রোনমাররা কাজ শুরু করেন। কৃষক ছাড়াও ফসল বাজারজাতকরণের সাথে ব্যবসায়ী এবং রাজস্ব আদায়ে নির্দিষ্ট সময়কাল জানার বিষয়ে রাজন্যবর্গ উৎসুক ছিল। ফলে ক্যালেন্ডার প্রণয়নে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সহজ হয়। এ ছাড়া রাজা বা সম্রাট তাদের শাসনকালের ইতিহাস রচনার জন্যেও ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ক্যালেন্ডার প্রণয়নে চাঁদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। অমাবস্যা থেকে পূর্ণ চাঁদ ও পুনরায় অমাবস্যা পর্যন্ত ফিরে আসতে প্রায় ত্রিশ দিন সময় লাগে। চাঁদের এই হ্রাস বৃদ্ধির সময়কালের হিসাব খুব সহজেই করা যায়। তাই ত্রিশ দিনে একমাস গণনা প্রাচীনকাল থেকেই অ্যাস্ট্রোনমারদের বিবেচনায় আসে। তবে বছরের হিসাব কিছুটা জটিল। সাধারণভাবে ঋতু পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বছরের হিসাব করা গেলেও সেটা খুব সঠিক হবে না। এই ক্ষেত্রে রাশিচক্র নামে পরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জ সমাধান নিয়ে আসে। প্রতি মাসে রাশিগুলো আকাশে বিশেষ অবস্থানে থাকে। বারোটি রাশি থেকে বারো মাসে বছরের হিসাব করা যায় এবং ঋতুচক্রও মিলে যায়। এক বছরে দিনের সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৩০ × ১২ = ৩৬০।

বর্তমান ইরাকের ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়ায় ৬০০০ বছর পূর্বে সুমেরীয় সভ্যতার উত্থান ঘটে। এটি সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা যাদের লিখিত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া গেছে। সুমেরীয় পরবর্তী একই এলাকায় আকাদীয় ও ব্যবিলনীয় সভ্যতারও লিখিত ইতিহাস রয়েছে। সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা ৩০ দিনে মাস, ১২ মাস ও ৩৬০ দিনে বছর গণনা করত। যদিও ৩৬৫ দিনে বছর হয়, ৩৬০ দিনে বছর গণনা সহজতর কারণ

এটি ৬০ দ্বারা বিভাজ্য। তাদের কাছে ৬০ সংখ্যাটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ষাট সেকেন্ডে মিনিট, ষাট মিনিটে ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টায় এক দিন ব্যাবিলনীয় প্রথা থেকে উদ্ভূত।

ব্যাবিলনীয়রা ৫টি গ্রহ জানত—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। ধারণা করা হয় সাত দিনে সপ্তাহের প্রচলন তাদের মাধ্যমে ঘটে। ব্যাবিলনীয়রা চন্দ্র, সূর্য ও ৫টি গ্রহের নামে দিনগুলোর নামকরণ করে। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই দিনের নামকরণ একইভাবে হয় যা আজও প্রচলিত। বাংলা ভাষায় রবি (সূর্য), সোম (চাঁদ), ও ৫টি গ্রহের নামে সাত দিন। ইউরোপে ফরাসি ও স্পেনীয়রা একইভাবে দিনের নাম দিয়েছে। তবে ইংরেজীতে সানডে, মানডে ও স্যাটারডে বাদে বাকি দিনগুলোর নামকরণ হয়েছে নর্ডিক দেবতাদের নামে।

প্রাচীন মিশরীয়রা জ্যামিতি ও স্থাপত্য ছাড়াও অ্যাস্ট্রোনমিতে পারদর্শী ছিল। নীল নদীর প্লাবনে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেত বলে এর অব্যবহিত পরে ফসলের মৌসুম শুরু হতো। এই কারণে প্লাবনের সঠিক পূর্বাভাস ছিল খুবই জরুরি। মিশরীয় অ্যাস্ট্রোনমাররা আবিষ্কার করেন যখন আকাশের সবচেয়ে উজ্জল নক্ষত্র লুব্ধক (সিরিয়াস) দিগন্তের উপর দিয়ে উঠে, তখন নীল নদের প্লাবন ঘটে। এটা ছিল বড়ো আবিষ্কার, এর ফলে কৃষকেরা চাষের জন্য যথাসময়ে প্রস্তুত হতে পারত। মিশরীয়দের অ্যাস্ট্রোনমি জ্ঞান পিরামিড নির্মানে প্রকৌশল বিদ্যার সহায়ক ছিল, যেমন গ্রেট পিরামিডের একটি বেজ নিখুঁতভাবে উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর স্থাপিত।

গ্রিক কসমোলজি

মহাবিশ্ব নিয়ে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে প্রাচীন গ্রিসে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। প্লেটো ছিলেন এর পথিকৃৎ। প্লেটোর আগেই গ্রিকরা জানত পৃথিবী গোলাকার, সমতল বা ফ্ল্যাট নয়। চন্দ্রগ্রহণকালে পৃথিবীর গোলাকার ছায়া থেকে গ্রিকরা এটা বুঝতে পারে। প্লেটো পৃথিবী কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা দেন। মহাবিশ্ব মাটি, আগুন, পানি ও বায়ু—এই চার মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরি। দূরের মহাজাগতিক বস্তুগুলো আগুনের তৈরি। পৃথিবী স্থির। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীকে

প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীসহ সব মহাজাগতিক বস্তুগুলো গোলাকার, গোলক সবচেয়ে পূর্নাঙ্গ আকৃতি।

প্লেটোর মহাবিশ্বের মডেলে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান অনুপস্থিত ছিল।

- যেকোনো ভারী বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে চাঁদ, সূর্য, গ্রহগুলো কীভাবে মহাকাশে ভেসে থাকে?
- পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণের গতিশক্তি বস্তুগুলো কীভাবে পায়?
- গ্রহদের গতিপথ একমুখী নয় কেন?
- চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধির কারণ কী?

যুক্তিবাদী দার্শনিক প্লেটোর কাছে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না কারণ তার মতে পর্যবেক্ষণ সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম নয়।

প্লেটোর ছাত্র ইউডক্সাস চাঁদ, সূর্য ও গ্রহগুলোর মহাকাশে অবস্থানের জন্য স্বচ্ছ স্ফটিকের বড়ো ও ছোটো ঘূর্ণায়মান গোলকের ধারণা সংযোজন করেন। প্লেটোর সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র এরিস্টটল যুক্তির পাশাপাশি প্রকৃতি দর্শনের উপর গুরুত্ব দেন। তার মতবাদ অনুযায়ী মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় যা যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব। তিনি ইউডক্সাসের মডেল গ্রহণ করে এর পরিবর্ধন করেন। এরিস্টটল চারটি মৌলিক উপাদান মাটি, পানি, বায়ু ও আগুনের সাথে পঞ্চম আর একটি উপাদান যোগ করেন—ইথার। প্রথম চারটি উপাদান দিয়ে পৃথিবী ও এর সবকিছু তৈরি। উপাদানগুলো অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষয়িষ্ণু বিধায় পার্থিব বস্তুগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম মহাজাগতিক বস্তু, এর কিছু পদার্থ ক্ষয়িষ্ণু উপাদান দিয়ে তৈরি বলে চাঁদে কলঙ্ক রয়েছে। পরবর্তী স্তর থেকে সব মহাজাগতিক বস্তু ইথার দিয়ে তৈরি। এরা সব গোলাকার, পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন। সবচেয়ে উপরের স্তরের গোলকটি মূল চালক (প্রাইম মুভার)। মূল চালক স্থির, কিন্তু অন্যান্য গোলকদের চলমান হতে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতি দর্শনের মূল চালক আধ্যাত্মিক দর্শনে ঈশ্বরের প্রতিরূপ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

খ্রিষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে মিশরীয় অ্যাস্ট্রোনমার ক্লদিয়াস টলেমি মহাবিশ্বের একটি মডেল প্রণয়ন করেন যা 'টলেমির ভূকেন্দ্রিক মডেল' নামে পরিচিত। এটিকে মহাবিশ্বের প্রথম পূর্নাঙ্গ ও গাণিতিক মডেল রূপে বিবেচনা করা

হয়। টলেমি গ্রহ ও অনেক নক্ষত্রের আকাশে অবস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। গ্রিক ভাষায় তার প্রণীত অ্যাস্ট্রোনমি বই 'সিনটাক্সিস মাথেমাতিকা' মধ্যযুগে আরবি ও পরে লাতিনে অনুদিত হয়ে আলমাজেস্ট নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কোপার্নিকাস যুগ পর্যন্ত অ্যাস্ট্রোনমির প্রধান গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।

এরিস্টটলের তত্ত্ব ও টলেমির ভূকেন্দ্রিক মডেল পরবর্তী দেড় হাজার বছরেরও বেশি সময় মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে টিকে থাকে। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ভ্যাটিকান এরিস্টটলের তত্ত্বকে খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ঘোষণা করে একে খ্রিস্ট ধর্মীয় মতবাদের অন্তর্ভূক্ত করে। ফলে ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের বিরোধী কোন ধারণা ধর্মবিরোধী (হেরেসি) এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোপার্নিকাস ও অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রেভ্যুলেশন

পঞ্চদশ শতকে ইউরোপ অন্ধকার যুগ পেরিয়ে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ যুগে প্রবেশ করে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সবক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তবে মূল বিপ্লব ঘটে অ্যাস্ট্রোনমিতে। মহাবিশ্ব সম্পর্কিত যুগ-যুগান্তরের ধারণার বিপরীতে নতুন এক ধারণা নিয়ে আসেন পোল্যান্ডের যাজক ও অ্যাস্ট্রোনমার নিকোলাস কোপার্নিকাস। তার মতে পৃথিবী নয়, সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। প্রদক্ষিণ ছাড়াও পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর আবর্তন করছে। নক্ষত্রগুলো স্থির, পৃথিবীর আবর্তনের কারণেই এদের ঘূর্ণায়মান দেখায়। তবে খ্রিষ্ট ধর্মীয় নেতৃবর্গের রোষানল থেকে বাঁচার জন্য তিনি এই তত্ত্ব খুবই সীমিত আকারে প্রচার করেন। এই বিষয়ে তার মূল বই On the Revolution of the Heavenly Spheres মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে ১৫৪৩ সালে প্রকাশ করেন।

স্বাভাবিকভাবেই খ্রিস্ট ধর্মগুরুদের কাছে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য ছিলনা, তারা এই ধারণাকে খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থি ঘোষণা করে। ইউরোপের অ্যাস্ট্রোনমি ও বুদ্ধিজীবি মহলে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এর স্বপক্ষে প্রমাণের অভাব ও গির্জার প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা জোড়ালো হতে পারেনি।